শ্রীশ্রী নৃসিংহ দেব

শ্রী মনোরঞ্জন দে

ভগবান শ্রী নৃসিংহদেব

শ্রী মনোরঞ্জন দে

সূর্যোদয়

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০১১

প্রকাশক
শ্রী মৃত্যুঞ্জয় পাল
সূর্যোদয়
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবা. ০১৯১২ ৫২৬৫৫৪

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ঢাকা ১১০০

ভিক্ষা মূল্য : ১৫.০০ টাকা

উৎসর্গ

জগৎ গুরু নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
শ্রীমদ্ ভক্তি সিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ-এর
করকমলে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এই বইটির অর্থানুকূল্য করেছেন ভক্তপ্রবর শ্রী দীপক দেবনাথ এবং শ্রীমতি কল্পনা দেবনাথ-এর ছেলে ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবের পরমভক্ত ভক্তপ্রবর শ্রী জয় দেবনাথ। তার পরিবারের সবার উপর শ্রী নৃসিংহদেবের কৃপা বর্ষিত হউক—এই কামনা করি।

লেখকের বইসমূহ

১. বৈষ্ণব সম্প্রদায়
২. বৈষ্ণব নামধারী অপ-সম্প্রদায়
৩. দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টী মহান্ত
৪. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলা
৫. শ্রী শ্রী রাধা তত্ত্ব
৬. শ্রী নৃসিংহদেব

পরবর্তী বই

বৈষ্ণব প্রদীপ (বৈষ্ণব ধর্মের দুই হাজার প্রশ্নের উত্তর)
মহাপ্রভুর বাল্যলীলা
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র

নিবেদন

ওঁ নমো ভগবতে নরসিংহায়

ভগবান শ্রী নৃসিংহদেব-এর কৃপা হলে বোবাও কথা বলতে পারেন। পঙ্গু ব্যক্তিও গিরি লংঘন করতে পারেন। নৃসিংহদেবের প্রতি আমার বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। তাই যখন-তখন প্রভুকে স্মরণ করি। তার ফল লাভ পাচ্ছি। একজন সৌখিন হস্তরেখাবিদ ও ঠিকুজী তৈরি কারক হিসাবেও আমি ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবের বন্দনা এবং স্তুতি করার পরামর্শ সকলকে দেয়ার চেষ্টা করি। দেখেছি তাতে অনেক ফল লাভ হয়।

অনেকদিন আগেই প্রভুর অদ্ভুত লীলা সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র বই সংকলনের ইচ্ছা থাকলেও নানা কারণে সম্ভব হয়ে উঠেনি। তাছাড়া যোগ্যতার প্রশ্নও এখানে আসে। এখন অতি দুঃসাহস করে এই ক্ষুদ্র বইটি সংকলন করেছি। এর সংকলনের জন্য যারা আমাকে কৃপাশীর্বাদ করেছেন তাদের মধ্যে ভাগবত প্রবর শ্রী প্রেম রতন গোস্বামী, ভক্ত প্রবর শ্রী দীপক দেবনাথ, ভাগবত প্রবর শ্রী দীপক গুপ্ত, ভক্ত প্রবর শ্রী সঞ্জয় মোদক, ভক্তপ্রবর শ্রী জয় দেবনাথ, এবং শ্রী চন্দন পোদ্দার ও নৃসিংহ মন্দিরের শ্রী চিদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ অন্যতম।

বইটির প্রকাশনার দায়িত্ব নেয়ায় ভক্ত প্রবর শ্রী মৃত্যুঞ্জয় পাল নিশ্চয়ই ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবের কৃপাভাজন হবেন সন্দেহ নেই। শ্রী শ্রী বঙ্কু বিহারী মন্দিরের সেবক শ্রী মান নিমাই প্রভু এবং শ্রী অনন্ত প্রভু এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন বিধায় তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ।

এই বই আমার সৃষ্ট কিছু নয়। বিভিন্ন পুথি-পুস্তকে শ্রী নৃসিংহদেব সম্পর্কে যে সব বিবরণ ও আলোচনা রয়েছে সেগুলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে একত্রিত করেছি মাত্র। এবিষয়ে আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নেই। শ্রী নৃসিংহদেবের ভক্তগণ এ থেকে উপকৃত হলেই এই দীন-অভাজন কৃতার্থ হবে।

জয় জয় শ্রী নৃসিংহ।

শুদ্রাধম
মনোরঞ্জন দে

সূচীপত্র

১.১ শ্রী নৃসিংহদেব কোন্ অবতার?

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণ বলেছেন—

> যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
> অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম ॥
> পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

উপরোক্ত শ্লোক থেকে বুঝা যায় শ্রী ভগবান মূলতঃ দুই কারণে আবির্ভূত হন।

১. পরিত্রানায় সাধুনাং—অর্থাৎ ভক্তগণের সুরক্ষার জন্য এবং অসুরদের হাত থেকে তাদের উদ্ধারের জন্য।

২. বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্—অর্থাৎ অসুরদের সংহার করার জন্য।

ভগবানের শক্তি অনন্ত। এই অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি শক্তি হল প্রধান : চিৎশক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি। তিনি এই তিন শক্তিতে অধিষ্ঠিত থেকে তিন ধরনের লীলা প্রকাশ করেন। চিৎশক্তিতে অধিষ্ঠিত থেকে ভগবান মাধুর্য্যময়ী, ঐশ্বর্য্যময়ী, ঔদার্য্যময়ী এবং ঐশ্বর্য্যপ্রধান মাধুর্য্যময়ী লীলা প্রকাশ করেন। মায়াশক্তিতে অধিষ্ঠিত হয়ে তিন ধরনের পুরুষ অবতার হয়ে বহিরঙ্গা শক্তির পরিচালনা করে থাকেন। আবার জীবশক্তিতে অধিষ্ঠিত থেকে লীলা অবতারসমূহের প্রকাশ করেন। এই লীলা অবতারসমূহ অংশ-অবতার বলেও পরিচিত। শ্রী নৃসিংহদের লীলাবতার বা স্বাংশ অবতারগণের অন্যতম।

শ্রী বিষ্ণুর প্রধান দশ অবতারের মধ্যে চতুর্থ অবতার হলেন শ্রী নৃসিংহদেব। শ্রীল ব্যাসদেবের পিতা মহর্ষি পরাশর তাঁর "হোরাশাস্ত্রে" শ্রী নৃসিংহদেবকে পরমেশ্বর ভগবানের চারটি স্বরূপের মধ্যে অন্যতম প্রধান প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন। ভগবান শ্রী নৃসিংহদেব হলেন পুরাপুরিভাবে পরমাংশ এবং পরমেশ্বর ভগবানের অপরাপর প্রকাশের অন্যতম।

ভগবান নৃসিংহদেব হলেন কল্প অবতার। এক কল্প হল ব্রহ্মার এক দিনের—অর্থাৎ ১২ ঘণ্টার সমান। একহাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার ১দিন তথা এক কল্প হয়। এর হিসাব হল নিম্নরূপ।

যুগের আয়ুষ্কাল	জড়জগতের হিসাবে বছর
১. কলিযুগ	৪,৩২,০০০
২. দ্বাপর যুগ	৮,৬৪,০০০
৩. ত্রেতাযুগ	১২,৯৬,০০০
৪. সত্যযুগ	১৭,২৮,০০০
সর্বমোট	৪,৩২০,০০০

এখন উপরোক্ত চার যুগের আয়ুষ্কাল হল জড়জগতের হিসাবে ৪৩,২০০০০ বছর। এইরূপ ১ হাজার চতুর্যুগে ১ কল্প তথা ব্রহ্মার ১ দিনের সমান হয়।

১ কল্পের সময়সীমা = ৪৩,২০০০০ × ১০০০

= ৪,৩২,০০০০০০০ বছর।

অর্থাৎ জড়জগতের হিসাবে চারশত বত্রিশ কোটি বছরে ১ কল্প তথা ব্রহ্মার ১ দিন হয়। এই সময়সীমায় ১০০০ সত্যযুগ রয়েছে। এই এক হাজার সত্যযুগের মধ্যে কোন এক বিশেষ সত্যযুগে ভগবান শ্রী নৃসিংহদেব আবির্ভূত হন। এই অর্থেই তিনি কল্প অবতার।

বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবও পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশসমূহের একটি। তিনিও প্রায় শ্রী কৃষ্ণের মত একই ঐশ্বর্যসম্পন্ন। কৃষ্ণ হলেন পূর্ণরূপে পূর্ণ। তাঁর পর হলেন পূর্ণ ভগবান শ্রী রামচন্দ্র এবং তার পরেই ভগবান শ্রী নৃসিংহদেব।

১.২ শ্রী নৃসিংহদেবের বিভিন্ন রূপ (বিভিন্ন রূপে শ্রী নৃসিংহদেবের প্রকাশ)

ভক্তদেরকে সুরক্ষা এবং অসুরদেরকে দমন করার জন্য শ্রী নৃসিংহদেব বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন।

১. শ্রী শ্রী উগ্রনৃসিংহদেব।
২. শ্রী শ্রী লক্ষ্মীনৃসিংহদেব।
৩. শ্রীভগবন নৃসিংহ।
৪. শ্রী চক্রবাড় নৃসিংহ।
৫. শ্রী পাণা নৃসিংহ।
৬. শ্রী শ্রী যোগানন্দ নৃসিংহ।
৭. শ্রী শ্রী জ্বালা নৃসিংহ।
৮. শ্রী করঞ্জ নৃসিংহ।
৯. শ্রী শ্রী মোহহ্লোহা নৃসিংহ।
১০. শ্রী শ্রী ভাবন নৃসিংহ।

শ্রী শ্রী উগ্রনৃসিংহ আবার কয়েক ধরনের হলেও (প্রধানত নয় প্রকার) তাঁর দুইরূপই প্রধান : ভীষণ উগ্রনৃসিংহদেব এবং স্থানু নৃসিংহদেব। ভারতের মহিশূর রাজ্যে এক সময় এক গ্রামে এক ভয়ংকর উগ্রনৃসিংহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নৃসিংহদেব তাঁর উরুর উপর অসুর হিরণ্যকশিপু-কে রেখে তার বক্ষ বিদীর্ণ করে তার নাড়িভুড়ি বের করে সারা বেদীর উপর ছড়িয়েছেন। সেখানকার পুজা-অর্চনা ছিল খুবই উচ্চমানের। সময় বিবর্তনে একসময় পুজার্চ্চনে শৈথিল্য দেখা দেয়। ফলে শ্রী নৃসিংহদেবের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে এক সময় পুরা গ্রামটিই ধ্বংস হয়ে যায়। ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবের এই ভীষণ উগ্রমূর্ত্তির বর্ণনা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ ভাগবতের সপ্তম স্কন্দে দিয়েছেন।

"সংরম্ভদুস্প্রেক্ষ্য করাললোচনো
ব্যাত্তাননান্তং বিলিহন্ স্বজিহ্বয়া।
অসৃগ্লবাক্তারুণকে শরাননো,
যথান্তমালী দ্বিপহত্যয়া হরিঃ ॥"

[শ্রীমদ্ ভাগবত ৭/৮/৩০]

অর্থাৎ দৈত্যবধে নৃসিংহদেবের চক্ষু অতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল। তাঁর দিকে ভয়ে তাকানো যাচ্ছিল না এবং জিহ্বা দ্বারা তিঁনি বিকশিত মুখপ্রান্ত লেহন করছিলেন। কেশর এবং মুখমণ্ডল রক্তে সিক্ত হয়ে অরুণ-বর্ণ-ধারণ করেছিল; হস্তিবধকারী সিংহের মতো হিরণ্যকশিপুর অন্ত্র, নাড়ি-ভুঁড়ি দিয়ে মালা ধারণ করেছিলেন। এইরূপে অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর অনুচরদের সকলকে বধ করে অসুর সকল নিঃশেষ করলেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনাকৃত সংঘের (ইসকন্) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রী নৃসিংহদেবের যে শ্রীমূর্ত্তি রয়েছেন তাও এক বিশেষ শ্রেণীর উগ্রনৃসিংহদেব। এই বিশেষ ভাবের বিগ্রহকে বলা হয় স্থানু-নৃসিংহদেব। অর্থাৎ এই নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর রাজদরবারের স্তম্ভ থেকে বের হয়েছেন মাত্র। ভীষণ ক্রুদ্ধ রূপ।

পরম ভক্ত প্রহ্লাদের কথার সত্যতা রক্ষা করার জন্যই ভগবান শ্রী নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর রাজদরবারের একটি স্তম্ভে এসে অবস্থান করেন এবং হিরণ্যকশিপু ঐ স্তম্ভে মুষ্ঠ্যাঘাত করামাত্রই ভয়ঙ্কর শব্দ করে সেখান থেকে পশুও নয়, আবার মানুষও নয়, এই রকম অতি অদ্ভুত নরসিংহ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্ ভাগবতে তাঁর এই আবির্ভাব নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা রয়েছে।

> "সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্যভাষিতং ব্যাপ্তিঞ্চ ভূতেষ্বখিলেষু চাত্মনঃ।
> অদৃশ্যতাত্যদ্ভুতরূপমুদ্বহন্ স্তম্ভে ন মৃগং ন মনুষ্যম্ ॥"

[শ্রীমদ্ ভাগবত ৭/৮/১৭]

দক্ষিণ ভারতের-বিশেষত অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন মন্দিরে উপরোক্ত বিভিন্নরূপের শ্রী নৃসিংহদেবের বিভিন্ন বিগ্রহ রয়েছে। এই প্রদেশে ৩২টি নরসিংহ ক্ষেত্র আছে এবং এসব ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানে ১০৮টি নরসিংহদেবের বিগ্রহ রয়েছেন। যেমন অন্তর্বেদী নামক এক নরসিংহ ক্ষেত্রে সুপ্রাচীন শ্রী লক্ষ্মী-নরসিংহ স্বামী মন্দির রয়েছে।

কথিত আছে যে এই অন্ধ্রপ্রদেশের অহোবলম নামক স্থানেই ভগবান শ্রী নৃসিংদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। বর্তমানে দুর্গম পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা এই অহোবলমই ছিল এক সময় হিরণ্যকশিপুর রাজপ্রাসাদ। একই

প্রদেশের পবিত্র কৃষ্ণা নদীর তীরে অবস্থিত বেড়াদ্রি হল এক প্রসিদ্ধ নরসিংহ তীর্থ। এখানকার লক্ষ্মী-নরসিংহ স্বামী মন্দির অতি প্রাচীন। নামে লক্ষ্মীনৃসিংহ স্বামী মন্দির হলেও এই মন্দিরের মূল অধিষ্ঠিত বিগ্রহ হলেন উগ্রনৃসিংহ। তবে মন্দিরের গায়ে প্রবেশমুখে লক্ষ্মীনৃসিংহ মূর্ত্তি খোদিত আছেন। মন্দিরের বাইরেও যোগাসনে উপবিষ্ট শ্রী নৃসিংহদেবের এক বিরাট বিগ্রহ রয়েছে। তাছাড়া এই মন্দিরের নিকটবর্তী পবিত্র কৃষ্ণা নদীতে শ্রী নৃসিংহদেব শালগ্রামরূপে প্রকটিত রয়েছেন বলে কথিত আছে। বলা হয় ভাগ্যবান ভক্তগণ কখনও কখনও এই নদীতে শ্রীনরসিংহ শালগ্রাম পেয়ে যান। উপরোক্ত স্থানেই গরুড়াদ্রি ও বেড়াদ্রি-এই নামের পাশাপাশি দুইটি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ভাবনাশিনী নামে একটি নদী প্রবাহিত। অনেকেই এই পাহাড় দুটিকে হিরণ্যকশিপুর রাজপ্রাসাদের সেই স্তম্ভের দুই ভাগ বলে মনে করেন যে স্তম্ভ দুইভাগে বিদীর্ন করে ভগবান শ্রী নৃসিংহদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন।

১.৩ শ্রী নৃসিংহ প্রনাম মন্ত্র

ভগবান শ্রী নৃসিংহদেব শাক্ত, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব ইত্যাদি সব সম্প্রদায় কর্তৃক প্রনম্য ভগবদ্-বিগ্রহ। শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁর বৃহৎ তন্ত্রসারঃ বইতে বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে নৃসিংহদেবের যে সব প্রণাম মন্ত্র উদ্ধার করেছেন তা নীচে বর্ণনা করা হল।

১. প্রথম প্রণাম ও জপ মন্ত্র

উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং
জলন্তং সর্ব্বতোমুখং।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং
মৃত্যু-মৃত্যুং নমাম্যহং ॥

উপরোক্ত মন্ত্রটি ৩২ অক্ষর বিশিষ্ট এবং প্রতি লাইনে ৮টি করে অক্ষর রয়েছে।

যাঁরা বৈষ্ণব তারা অনেকেই এই মন্ত্রটির পূর্বে ওঁ এই শব্দ যোগ করে পাঠ করেন। আর যারা তান্ত্রিক তারা উক্ত মন্ত্রের আগে এবং শেষে ক্ষ্রৌঁ এই শব্দ যোগ করে জপ করেন। তন্ত্রশাস্ত্র বিশারদদের মতে

এইভাবে জপ করলে সাধকের সর্বপ্রকার কামনা-বাসনা পূর্ণ হয়। তাদের মতে উপরোক্ত মন্ত্র ন্যাস করে নৃসিংহদেবের নিম্নোক্ত মূর্ত্তির ধ্যান করতে হবে।

ভগবান নৃসিংহদেবের শ্রী মূর্ত্তি এই প্রকার : মানিক্যময় পর্বতের ন্যায়দেহকান্তি এবং নিজ শরীর প্রভায় রাক্ষসগণ-ভীত হচ্ছে। দুই হাত হাটুর উপর বিন্যস্ত রয়েছে। তাঁর তিনটি নয়ন (চক্ষু) এবং তিঁনি রত্ননির্মিত বিভূষণে বিভূষিত। দুই হাতে শঙ্খ এবং চক্র রয়েছে। দন্ত দ্বারা বিকট বদন থেকে আগুনের শিখার ন্যায় জিহ্বা বহির্গত হয়েছে। তাঁর দীর্ঘকেশর রয়েছে এবং দেহ নৃসিংহের আকার—অর্থাৎ অর্ধেক দেহ সিংহ আকৃতির এবং অর্ধেক দেহ মানুষের ন্যায়। এই প্রকার মূর্ত্তি মনে চিন্তা করে উপরোক্ত মন্ত্র জপ এবং ধ্যান করলে সর্বসিদ্ধি লাভ হবে বলে তন্ত্রশাস্ত্রবিদরা মনে করেন।

২. দ্বিতীয় প্রণাম ও জপ মন্ত্র : এই মন্ত্রটি মূলত তন্ত্রশাস্ত্রবিদগণ জপে থাকেন তাদের বিভিন্ন উদ্দেশ্য লাভের কামনায়।

আং,হ্রীঁ, ক্ষৌঁ ক্রৌঁ হুঁ ফট।

উপরোক্ত মন্ত্রটি ষড়াক্ষর বিশিষ্ট—অর্থাৎ এতে ছয়টিমাত্র অক্ষর আছে। এই মন্ত্র পাঠ বা জপ করার সময় শ্রী নৃসিংহদেবের নিম্নোক্ত মূর্ত্তির ধ্যান করতে হবে।

শ্রী নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি : কোপে বা রাগের কারণে লোলজিহ্বা এবং বিস্তৃত বদন। তাঁর তিনটি নেত্র রয়েছে যা চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নিস্বরূপ। পা থেকে নাভি পর্যন্ত তাঁর দেহের রং রক্তবর্ণ এবং উপরের অংশ শ্বেতবর্ণ (সাদাবর্ণ)। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর দেহ বিদীর্ন করছেন। শঙ্খ, চক্র, পাশ, বজ্র এবং গদা ধারণ করেছেন। ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ দাঁত বিশিষ্ট এবং মনিময় আভরণে বিভূষিত। এই প্রকার চিন্তা করে ধ্যান করে মানস-উপাচারে পুঁজা করতে পারলে শ্রী নৃসিংহদেব ভক্তকে সর্বতোভাবে কৃপা করেন।

৩. তৃতীয় প্রণাম ও জপ মন্ত্র : এই মন্ত্রটিও তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে।

মন্ত্রটি হলো : **ক্ষ্রৌঁ**

এই এক অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্রটিকে সর্বকাম ফলপ্রদ বলে তন্ত্রবিশারদরা দাবী করেন। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে আট লক্ষবার জপ এবং জপের দশাংহোম করলে ভক্তের সকল মনোবাসনা পূরণ হয়। সাধারণত তন্ত্রসাধনে রত বা বিশ্বাসী ভক্তরা এই মন্ত্র জপ করতে পারেন।

৪. চতুর্থ প্রণাম এবং জপ মন্ত্র : এই মন্ত্রটি আট অক্ষর বিশিষ্ট এবং যেকোন সম্প্রদায়ের (তান্ত্রিক/শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি) লোকেরাই এই মন্ত্র জপ করতে পারেন।

মন্ত্রটি হলো : জয় জয় শ্রী নৃসিংহ

এই মন্ত্রকে সাধকের কামপ্রদমনিস্বরূপ বলা হয়। এখানেও এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে আট লক্ষ বার জপ এবং জপের দশাংশ হোম করতে হবে।

৫. পঞ্চম প্রণাম এবং জপ মন্ত্র : এই প্রণাম মন্ত্রটি বত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট। এতে ভক্তবৎসল শ্রী নৃসিংহ এবং তাঁর ভক্ত প্রহ্লাদ-এর কথা রয়েছে।

মন্ত্রটি হলো নিম্নরূপ :

নমস্তে নরসিংহায়
প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ
শিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥

অর্থাৎ যিনি ভক্ত প্রহ্লাদের আনন্দদাতা, যাঁর বাটালির মতো নখ দৈত্য হিরণ্যকশিপুর শিলার মতো বক্ষে আঘাত হেনেছিল, সেই শ্রী নৃসিংহ দেবকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

১.৪ শ্রী নৃসিংহ মন্ত্রাদির প্রয়োগ বিধি

বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রে শ্রীনৃসিংহদেবের বিভিন্ন প্রণাম ও জপবিধি বর্ণিত হয়েছে। নীচে এই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১. যিনি বেলগাছের কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্জলিত করে তাতে লবঙ্গ দ্বারা অথবা বেলপাতা দ্বারা এক হাজার বার হোম করতে পারবেন তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্মীকে লাভ করতে পারবেন। আবার বেলপুষ্প অথবা বেলদ্বারা হোম করলেও একই ফল লাভ হবে।

২. শ্রী নৃসিংহদেবের উপরে উল্লিখিত কোন মন্ত্র জপ করে দূর্ব্বা দ্বারা শতবার হোম করতে পারলে রুগ্নব্যক্তি আরোগ্য লাভ করতে পারবেন।

৩. যদি রাত্রিকালে দুঃস্বপ্ন দর্শন হয় তাহলে ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবের উপরে উল্লিখিত যেকোন মূর্ত্তির ধ্যান করে যেকোন মন্ত্র জপ করলেই হবে।

৪. যদি রাত্রিকালে নিদ্রা না হয়, তবে উপরে উল্লিখিত যেকোন মন্ত্র জপ করলে সুখে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা হবে।

৫. যদি কোন ব্যক্তি বনে-জঙ্গলে বাঘ বা কোন হিংস্র প্রাণী, বা কোনদস্যু দ্বারা ভয়ে আকুল হন তাহলে উপরে উল্লিখিত প্রথম মন্ত্রটি জপ করতে থাকলে ঐ ভয় তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হবে।

৬. উপরে উল্লিখিত প্রথম অথবা দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা ১. নং বিধিতে প্রাপ্ত ভস্ম অভিমন্ত্রিত করে যদি সর্বাঙ্গে লেপন করা যায় তবে মন্ত্রের প্রভাবে বিষ-জনিত এবং গ্রহজনিত মহাভয় দূর হয়ে যাবে। অর্থাৎ যেকোন গ্রহের কু-দৃষ্টি দূর হয়ে যাবে।

৭. যাদুটোনা, বানমারা, উচ্চাটন, যেকোন উৎস থেকে মহা-উৎপাত এবং মহাভয় উপস্থিত হলে প্রথম অথবা দ্বিতীয় মন্ত্রের উল্লিখিত নৃসিংহ মূর্ত্তির ধ্যান করে ঐ মন্ত্র জপ করতে হবে। এতে ভক্তের সব আপদ, বিপদ এবং দুঃখ আর থাকবে না। এক্ষেত্রে নিজের আত্মায় বা হৃদয়ে মহাভীষণরূপ ঐ নৃসিংহদেবের ধ্যান করে পরে শত্রুকে হরিণ শিশুর মত ভাবনা করবেন এবং মনে মনে ঐ শত্রুর গলদেশে ধরে (গলা চেপে ধরে) তৎক্ষনাৎ একদিকে নিক্ষেপ করে দিবেন। এরূপ করতে পারলে শত্রুর মিত্র এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদিসহ সবার উচ্চাটন—অর্থাৎ মহাউদ্বেক এবং মহা অশান্তি সৃষ্টি হবে।

১.৫ ভক্তরক্ষক শ্রী নৃসিংহদেব

শ্রী নৃসিংহদেব তাঁর ভক্তগণকে সংকটকালীন সময়ে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। নীচে এই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হল।

১. শ্রী প্রহ্লাদ মহারাজ : সত্যযুগে ভক্তি পথের মূর্ত্তিমান বিঘ্নস্বরূপ ছিল দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু। ছোট ভাই হিরণ্যাক্ষকে ভগবান বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করে বধ করায় হিরণ্যকশিপু শ্রীহরির বিদ্বেষী হয়ে পড়ে। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু একসময় ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে স্বর্গ, মর্ত, পাতালসহ দশদিক অধিকার করে দেবতাসহ বিষ্ণু ভক্তদের উপর অত্যাচার করতে আরম্ভ করে। তার এই অত্যাচারের কোন প্রতিকার নেই জেনে দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। ভগবান বিষ্ণু তাদের বললেন—

নির্বৈরায় প্রশান্তায় স্বসুতায় মহাত্মনে।
প্রহ্লাদায় যদা দ্রুহ্যেদ্ধনিষ্যেঽপি বরোর্জিতম ॥

[শ্রীমদ্ ভাগবত ৭/৪/২৮]

অর্থাৎ হিরণ্যকশিপু যখন তার নিজেরই পুত্র অজাত শত্রু অতি শান্ত মহাত্মা প্রহ্লাদকে হিংসা করে তার উপর অত্যাচার করবে, তখনই বর-মত্ত দৈত্যরাজকে আমি বধ করবো।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর চারটি পুত্র ছিল : হ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ এবং প্রহ্লাদ। এদের মধ্যে প্রহ্লাদই ছিলেন সর্বগুণে গুনান্বিত, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় এবং সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। অসুর কূলে জন্ম হলেও প্রহ্লাদ আসুরিক ভাব, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি থেকে মুক্ত ছিলেন। প্রহ্লাদ নারায়নে তাঁর চিত্ত সমর্পিত করেছিলেন। তাই নারায়নের উপর প্রহ্লাদের ঐকান্তিক ভক্তি ছিল।

ক্বচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠ চিন্তাশবলচেতনঃ।
ক্বচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদগায়তি ক্বচিৎ ॥

বৈকুণ্ঠ অধিপতির চিন্তায় প্রহ্লাদ কখনো কাঁদতেন, কখনও বা তাঁর চিন্তায় আনন্দিত হয়ে হাসতেন। আবার কখনও গান করতেন। কখনও লজ্জা ত্যাগ করে নাচতেন। আবার কখনও তাঁর চিন্তায় তন্ময় হয়ে ভগবান বিষ্ণুর বিভিন্ন লীলা স্মরণ করতেন। কখনও বা শ্রীভগবানের অঙ্গে তার শরীরের স্পর্শ হয়েছে এই ভাবনায় প্রহ্লাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

হিরণ্যকশিপু কর্তৃক নিযুক্ত দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য্যের দুই পুত্র ষণ্ড এবং অমর্ক প্রহ্লাদকে বিভিন্ন উপদেশ দিলেও বিষ্ণুভক্তিতে তিনি অটল থাকেন। গুরুদের এবং হিরণ্যকশিপুকে বরং শ্রীহরির মাহাত্ম সম্পর্কে প্রহ্লাদ উপদেশমূলক কথা বলতে শুরু করেন। একসময় হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদকে বিভিন্ন উপায়ে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় প্রতিবারই প্রহ্লাদ রক্ষা পেয়ে যান।

হোলিকা নামে হিরণ্যকশিপুর এক বোন ছিল। তার এমন একটি শাড়ী ছিল যা তাকে আগুন থেকে রক্ষা করতে পারতো। একদিন হোলিকা প্রহ্লাদকে নিয়ে ঐ শাড়ী পড়ে আগুনে ঝাঁপ দেয় যাতে প্রহ্লাদ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। কিন্তু শ্রী বিষ্ণুর কৃপায় প্রহ্লাদ রক্ষা পান, বরং হোলিকা নিজেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়।

কোনক্রমেই বিষ্ণুভক্তি থেকে বিচ্যুত করতে না পেরে একদিন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করেন যে তাঁর পরিত্রাণকারী বিষ্ণু কোথায় থাকেন। উত্তরে প্রহ্লাদ বলেন যে তিঁনি সর্বত্র এবং সব কিছুর মধ্যেই বিরাজ করেন। হিরণ্যকশিপু তখন একটি স্তম্ভ দেখিয়ে বলে যে এর মধ্যেও কি তিনি আছেন? প্রহ্লাদ বললেন হ্যা। হিরণ্যকশিপু তখন প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলে যে তাহলে এখনই তাঁকে মেরে ফেলবো। এই বলে হিরণ্যকশিপু ঐ স্তম্ভে যেই আঘাত করল তখনই ভক্তের কথা রক্ষা এবং তার সুরক্ষার জন্য ঐ স্তম্ভ থেকেই ঘোর গর্জন এবং বজ্রের মতো শব্দ করে ভগবান শ্রী নৃসিংহদেব আবির্ভূত হন। বিড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলা করে সেই ধরনের যুদ্ধ করে এক সময় শ্রী নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে তাঁর উরুতে রেখে হাতের আঙ্গুলের কঠিন নখের আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এভাবে শ্রী নৃসিংহদেব তাঁর পরম ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষার পাশাপাশি অত্যাচারী এক শাসকের হাত থেকে বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডকে রক্ষা করেন।

২. নৃসিংহদেব কর্তৃক বশিষ্ঠ মুনিকে সুরক্ষা প্রদান : দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ছোট ভাই হিরণ্যাক্ষের এক পুত্র ছিল। তার নাম ছিল রক্ত বিলোচন। এক সময় গোদাবরী নদীর তীরে এই রক্ত বিলোচন দশ হাজার বছর কঠোর তপস্যা করে শিবকে সন্তুষ্ট করে তাঁর কৃপা লাভ

করে। রক্ত বিলোচনের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব তার সামনে আবির্ভূত হন এবং বলেন যে সে যাই চাইবে তাই তাকে প্রদান করা হবে। শিবের এই উদারতার সুযোগ নিয়ে রক্ত বিলোচন এক অদ্ভুতবর চায়। সে এই বর চাইল যে যদি যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও তার শরীর থেকে রক্তপাত হয় তাহলেই এই রক্তপাত থেকে যত সংখ্যক ধূলিকণা ভিজে উঠবে, ভূমি থেকে যেন ঐসময়ই তত সংখ্যক তারই মতো শক্তিশালী দানব উৎপন্ন হয়ে যুদ্ধে যেন তাকে সহযোগিতা করে। আর যুদ্ধশেষে ঐ সব দানবেরা যেন তার মধ্যে লীন বা মিশে যায়। ভগবান শিব এই অদ্ভুত বর লাভের ইচ্ছা শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু আগেই প্রতিশ্রুতি দেয়ায় তিনি রক্ত বিলোচনের এই প্রার্থনা অনুমোদন করলেন। শিবের বর পেয়েই রক্ত বিলোচন তখন দেবতা, ব্রাহ্মণ, সাধু, ভগবৎ ভক্ত, গাভী ইত্যাদির উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করা শুরু করে। সে মুনিঋষিদের যাগযজ্ঞ এবং বৈদিক বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে বাধা দিতে আরম্ভ করলো।

বিশ্বামিত্র মুনি কোন এক কারণে বশিষ্ঠ মুনির বিরোধী ছিলেন। সুযোগ পেলেই তিনি বশিষ্ঠের অনিষ্ট করতেন। রক্ত বিলোচনকে তিনি এই কাজে লাগালেন। একদিন বশিষ্ঠ মুনির অনুপস্থিতিতে তার একশত পুত্রকে হত্যার জন্য বিশ্বমিত্র মুনি রক্ত বিলোচনকে প্ররোচিত করলেন। তার কথা অনুযায়ী রক্ত বিলোচন বশিষ্ঠ মুনির একশত পুত্রকে হত্যা করে। বশিষ্ঠ মুনি ঐ সময় ব্রহ্মলোকে ছিলেন। বশিষ্ঠ মুনির স্ত্রী অরুন্ধতী তখন শতপুত্রের মৃত্যুতে শোকে-দুঃখে কান্না করতে করতে বশিষ্ঠ মুনিকে স্মরণ করতে থাকেন। বশিষ্ঠ মুনি তখন দিব্যদৃষ্টিতে তাঁর আশ্রমে কি ঘটেছে তা দেখতে পেলেন এবং তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু শিবের বরে বলীয়ান রক্ত বিলোচনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার করতে পারলেন না। তখন এই দানবকে ধ্বংসের লক্ষ্যে তিনি শ্রী নৃসিংহদেবের উদ্দেশ্যে নিন্মোক্ত প্রার্থনা করতে থাকেন—

প্রহ্লাদ বরদং বিষ্ণুং নৃসিংহং পরদিবতম্।
শরনং সর্বলোকানামাপন্নরতি নিবারনম্ ॥

ভক্ত বশিষ্ঠকে তখন রক্ষার জন্য গরুড়ের পিঠে আরোহন করে ভগবান শ্রী নৃসিংহদেব লক্ষ্মীদেবীসহ গোদাবরী নদীর তীরে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। করজোড়ে নৃসিংহদেবের মহিমাকীর্তনের পর বশিষ্ঠ মুনি তাঁর কাছে সাধুদের প্রতি রক্ত বিলোচনের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার এবং তার শত পুত্রকে হত্যার বর্ণনা দেন। শ্রী নৃসিংহদেবের কাছে বশিষ্ঠ মুনি এই প্রার্থনাও করেন যে রক্ত বিলোচনকে হত্যার পর ভগবান নৃসিংহদেব যেন তার আশ্রমে অধিষ্ঠিত থাকেন যাতে মুনি সবসময় সেখানে তাঁর অর্চনা এবং আরাধনা করতে পারেন। ভগবান নৃসিংহদেব বশিষ্ঠ মুনির এই আবেদনে সম্মতি দেন।

এরপর ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে দানব রক্ত বিলোচনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। রক্ত বিলোচন ভগবানের ভয়ঙ্কর শঙ্খধ্বনি শুনে সেখানে এগিয়ে আসে। সে ভগবান নৃসিংহদেবকে সৈন্য সামন্ত নিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে তাঁর দিকে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু ভগবান নৃসিংহেদেব তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা রক্ত বিলোচনের সমস্ত অস্ত্র এবং আক্রমন প্রতিহত করেন। যুদ্ধ করতে করতে এক সময় রক্ত বিলোচনের দেহ থেকে ভগবানের অস্ত্রের আঘাতে রক্তপাত হয়ে নীচের ধূলিকণা ভিজে উঠলো। আর এই সময়ে শিবের বর হেতু যত ধূলিকণা রক্তে ভিজেছিল ঠিক তত সংখ্যক রক্ত বিলোচনের সমান শক্তি সম্পন্ন দানবের সৃষ্টি হলো। সৃষ্ট দানবেরা শ্রী নৃসিংহদেবের বাহন মহাশক্তিশালী গরুড়দেবকে আঘাত করতে আরম্ভ করলে গরুড় তাদের সেই আক্রমণ প্রতিহত করে পাল্টা আক্রমণ করায় ঐসব দানব তা সহ্য করতে অক্ষম হলো। এই ঘটনা লক্ষ্য করে দানব রক্ত বিলোচন নিজেই গরুড়কে লক্ষ্য করে একের পর এক ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু তার কোন অস্ত্রই গরুড়দেবকে আঘাত করতে সক্ষম হলো না। কারণ সেই সব অস্ত্র গরুড়ের গায়ে আঘাত করার আগেই ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর সুদর্শনচক্র দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করে দেন।

যুদ্ধ সংক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যে তখন ভগবান স্থির করলেন যে রক্ত বিলোচনের রক্ত যেন মাটিতে না পরে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। এই লক্ষ্যে তিনি তার মায়া শক্তির প্রকাশ ঘটালেন। তারপর সুদর্শনচক্রদ্বারা

দানব রক্ত বিলোচনের দুই হাত প্রথমে কেঁটে ফেললেন। এরপর অপরাপর অসুরসহ রক্ত বিলোচনকে নিহত করলেন। রক্ত বিলোচন নিহত হওয়ার পর মায়াশক্তি যত রক্ত ধরে রেখেছিলেন তা এখন মুক্ত করে দেয়ার পর সেখানে এক রক্ত বর্ণের নদী সৃষ্টি হয় যা রক্তকুল্য নামে পরিচিত হয়। এই নদী দেবতা বা দানব কেউ পার হতে পারতো না। রক্ত বিলোচনসহ অপরাপর দানবদেরকে নিহত করার পর ভগবান যে স্থানে তাঁর সুদর্শন চক্রকে ধৌত করেছিলেন সেই স্থানটি চক্রতীর্থম নামে পরিচিত হয়। কথিত আছে ঐ স্থানের পাশের নদীতে ডুব দিয়ে স্নান করলে সকল পাপ মুছে যায়। জয়ের আনন্দে এবং কৃতজ্ঞতায় বশিষ্ঠ মুনি তার আশ্রমে ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন।

৩. লিঙ্গস্ফোট-নৃসিংহদেব কর্তৃক ভক্ত সংরক্ষণ : বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থের শেষভাগে ভগবান নৃসিংহদেব কর্তৃক কিভাবে একজন ভক্তের সংরক্ষণ হয়েছিল সে সম্পর্কে একটি কাহিনী বা উপাখ্যান আছে।

বিষ্ককসেন নামে এক ব্রাহ্মণ একান্ত বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন। তিনি তীর্থ ভ্রমণে বের হয়ে এক সময় এক গ্রামে পৌছেন। ঐ গ্রামের অধ্যক্ষের এক পুত্রের সাথে তিনি মিলিত হন। তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। গ্রাম অধ্যক্ষের পুত্র শিবের আরাধনা করতেন—অর্থাৎ তিনি ছিলেন একান্ত ভাবে শিব ভক্ত। এই ভক্ত প্রতি রাত্রে চার প্রহরে চারবার শিবের পুজা করতেন। একদিন হঠাৎ তার জ্বর হয়। তিনি সেদিন রাত্রে আর শিব পুজা করতে সমর্থ হলেন না। অবশেষে নিজের বন্ধু তীর্থ যাত্রী ব্রাহ্মণ যুবককে শিব পুজা করবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ যুবক বিষ্ণু ভক্ত হওয়ায় বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন দেবতার পুজা করতে রাজী হলেন না। অবশেষে গ্রাম অধ্যক্ষের ঐ পুত্র ব্রাহ্মণের প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হলে নিরূপায় হয়ে নিজের প্রাণ রক্ষার খাতিরে বাধ্যে আদেশ পালন করতে সম্মত হলেন। কিন্তু অন্তরে নিজের ইষ্টদেবকে ধ্যান করতে লাগলেন। বন্ধুর সাথে পুজামণ্ডপে উপস্থিত হয়ে শিবলিঙ্গ-সমীপে অবস্থান করে **"শ্রী নৃসিংহায় নমঃ"**-এই মন্ত্রে অভিষিক্ত করে

পুষ্পাদি শিবের মাথায় প্রদান করলেন। তখন গ্রাম অধ্যক্ষের পুত্র রাগে কোপিত হয়ে খড়গ ধারা সেই ব্রাহ্মণ যুবককে হত্যা করতে উদ্যত হলে স্বয়ং ভগবান শ্রী নৃসিংহদেব শিবলিঙ্গ ভেদ করে আবির্ভূত হন এবং সপরিকর ঐ গ্রাম অধ্যক্ষের পুত্রকে বিনাশ করে তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন। শিবলিঙ্গ থেকে বের হওয়ায় এই নৃসিংহ মূর্ত্তিকে লিঙ্গস্ফোট নৃসিংহদেব বলা হয়।

"শ্রী নৃসিংহ, জয়নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্ম ভৃঙ্গ ॥

৪. ভক্ত শ্রীবিষ্ণু স্বামী : ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবের ন্যায় তাঁর ভক্তগণও তাঁর কৃপায় ভক্তিপথ সংরক্ষণ করতে সক্ষম হন। এর অন্যতম উদাহরণ হলেন রুদ্র সম্প্রদায় নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী। তিনি বেদান্ত দর্শনের ক্ষেত্রে রুদ্রের বিচার অবলম্বন করে জগতে বিষ্ণুভক্তির কথা প্রচার করেন।

কলিযুগে এক সময় বৌদ্ধ ধর্মের অত্যন্ত বিস্তার লাভ হলে শ্রীবিষ্ণুস্বামী নৃসিংহদেবের আশ্রয়ে শুদ্ধ-অদ্বৈতবাদ প্রচার করে ভক্তিপথ সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পাণ্ড্যদেশে পাণ্ডু বিজয় নামক এক রাজার বিষ্ণুভক্ত পুরোহিত দেবেশ্বরের গৃহে তিনি আবির্ভূত হন।

বেদ-বিরোধী বৌদ্ধগণের সনাতন ধর্ম বিলোপ করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করে শ্রীবিষ্ণুস্বামী শ্রুতি শাস্ত্রের (উপনিষদ) সারস্বরূপ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রচার করেন। এই ভাষ্যই সর্বজ্ঞ সুক্ত নামে পরিচিত। এতে শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ উপস্থাপন এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৎকালীন সময়ে তিনি সাতশত সন্ন্যাসীকে নৃসিংহমন্ত্রে দীক্ষিত করে ভক্তি মার্গের প্রচার করেন।

৫. শ্রীল শ্রীধর স্বামীপাদ : শ্রীবিষ্ণু স্বামীর অধঃস্তন শ্রীধর স্বামীপাদও ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবের উপাসক ছিলেন। তিনি রুদ্র সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন। তবে হরি-হরকে অভিন্ন জেনেও তিনি

মূলতঃ ভগবান নৃসিংহদেবের উপাসনা করতেন। নিজ সম্প্রদায়ের ভক্তদের অনুরোধে শ্রীভগবান নৃসিংহদেবের কৃপায় তিনি পরম্পরা অনুসরণ করে শ্রীমদ্ ভাগবতের ভাবার্থদীপিকা নামক টীকা রচনা করেন। এই টীকায় তিনি ভেদ-অভেদ-এর সমর্থনে ভক্তি, শাস্ত্র এবং জীবের (আত্মার) নিত্যতা এবং জগতের সত্যতা প্রতিপাদন করেন। তিনি শ্রীবিষ্ণু স্বামীর সর্বজ্ঞ সূত্রের প্রমান উদ্ধার করেন। আবার বিষ্ণু পুরানের টীকা রচনা করে তিনি শ্রীপাদ্ শঙ্করাচার্য্যের কেবলাদ্বৈত মতবাদ খণ্ডন করে শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ভাগবতের উপরোক্ত টীকায় (ভাবার্থদিপীকায়) তিনি ভক্তি, ভগবান এবং ভক্তের নিত্যতা, জীব এবং ঈশ্বরের পার্থক্য, মুক্তির প্রাসঙ্গিকতা, নির্ভেদ মুক্তির নিন্দা এবং শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি দ্বারা ভক্তিপথের নিত্যতা প্রমাণ করেন।

মায়াবাদীরা (শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের অনুসারীগণ) নির্বিশেষ ব্রহ্মকে পরতত্ত্ব বললেও তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণকেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, ঘনিভূত ব্রহ্ম বলেন। কেবলাদ্বৈতবাদীরা ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, নাম, রূপ, বিভূতি, ধাম ও পরিকরের (শুদ্ধ ভক্ত বা পার্যদ) নিত্যতা স্বীকার না করলেও শ্রীবিগ্রহ যে সনাতন ও অপরিমেয় তার সত্যতা তিনি স্থাপন করতে সমর্থ হন।

শ্রীমদ ভাগবতের টীকা ভাবার্থদিপীকা-র প্রথমেই শ্রীধর স্বামীপাদ শ্রী নৃসিংহদেবের স্বরূপ নির্ণয়ে বলেন—

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে ॥

অর্থাৎ বাগদেবী সরস্বতী যাঁর বদনে, লক্ষ্মী যাঁর বক্ষস্থলে এবং সম্বিৎ (জ্ঞান) শক্তি যাঁর হৃদয়ে বিরাজমান, সেই নৃসিংহদেবকে আমি ভজনা করি।

শ্রীনৃহসিংহদেবের উপাসক এবং ভক্তিমার্গের সংরক্ষক বলে শ্রীধর স্বামীকে মহাপ্রভু জগদ্গুরুর আসন প্রদান করেছেন। শ্রী নৃসিংহদেবের কৃপায় সর্ববেত্তা শ্রীধর স্বামীপাদ শ্রীমদ্ ভাগবতের যে টীকা রচনা করেন

শ্রীমন মহাপ্রভু তাতেই সম্মতি প্রদান করে ঐ বইয়ের আদর্শে তিনি পরবর্তীকালে ভাগবতের যে কোন টীকা রচনায় ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেন—

শ্রীধর স্বামী প্রসাদে সে ভাগবত জানি।
জগৎগুরু শ্রীধর স্বামী গুরু করি মানি ॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সবলোক মান্য করি করিবে গ্রহণ ॥

[চৈ. চ. অন্ত্য ৭/১২৯, ১৩১]

এই জন্যই দেখা যায় শ্রীবল্লাভাচার্য্য নামে একজন অতি উচ্চস্তরের জ্ঞানী বৈষ্ণব যখন মহাপ্রভুর সামনে বলেছিলেন যে তিনি স্বামীর (শ্রীধর স্বামীর) ভাগবতের ব্যাখ্যা মানি না তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভু রহস্য করে বলেছিলেন : স্বামীকে যিনি মানেন না তিনি বেশ্যা। অর্থাৎ পূর্বতন আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা অধঃস্তনরা না মানলে তিনি পতিত বলে বিবেচিত বা পরিগণিত হন।

১.৬ শ্রী নৃসিংহদেবের স্তব এবং বন্দনা

শুদ্ধভক্তি প্রচারক ভক্তগণের একমাত্র সংরক্ষক শ্রী নৃসিংহদেব। শ্রী নৃসিংহদেবের কৃপায় ভক্তগণ যাবতীয় ভক্তি বিরোধীদলকে জয় করতে সমর্থ। শ্রী নৃসিংহদেবের উপাসকগণ সকলেই ভক্তিমার্গের প্রচারক হন। এই জন্যই তাঁর উপাসকগণ শ্রীমন্ মহা প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়। স্বয়ং ভগবান শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজেই নৃসিংহদেবের বন্দনা করে সব ভক্তের জন্যই নৃসিংহ উপাসনার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এর বর্ণনা পাওযা যায়—

বাইস পহাচ পাছে উত্তর দক্ষিণে।
এক নৃসিংহ মূর্ত্তি আছেন উঠিতে বামভাগে ॥
প্রতিদিন তাঁরে প্রভু করেন নমস্কার।
নমস্করি করি এই শ্লোক পড়ে বার বার ॥

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো ।
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ ।
বহি নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥

অর্থাৎ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন পুরীধামের শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখে বাইস পহাচ (সিড়ি) দিয়ে উঠার সময় বামদিকে বিরাজমান শ্রী নৃসিংহদেবের বিগ্রহ দর্শন করে প্রণাম নিবেদন করে শেষের দুইটি শ্লোক বার বার আবৃত্তি করতেন। তিনি বলতেন এদিকে নৃসিংহ ওদিকে নৃসিংহ, যেখানে যেখানে যাই সেখানেই নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ আর হৃদয়ে নৃসিংহ—এরূপ সেই আদি নৃসিংহদেবের আমি শরনাপন্ন হলাম।

শ্রীল জয়দেব গোস্বামী তার শ্রী গীতগোবিন্দ কাব্যে ভগবানের দশ অবতারের স্তোত্রে ভগবান নৃসিংহদেবের বন্দনা নিম্নোক্তভাবে করেছেন—

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিত হিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ।
কেশবধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥

অর্থাৎ হে কেশব যখন আপনি নৃসিংহ রূপ ধারণ করেছিলেন, তখন আপনার কমলের মতো হাতের নখসমূহ অতি অদ্ভুতভাবে অগ্রভাগযুক্ত হয়েছিল। আপনি ঐ নখসমূহ দ্বারা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর দেহকে বিদীর্ন বা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছিলেন। হে নৃসিংহরূপী জগদীশ! হে হরি! আপনার জয় হোক।

শ্রী নৃসিংহদেবের একান্ত ভক্ত শ্রী প্রহ্লাদ মহারাজ বিভিন্নভাবে তাঁর বন্দনা এবং স্তুতি করেছেন। তার নিম্নোক্ত প্রার্থনাটি অন্যতম প্রধান।

ওঁ নমো ভগবতে নরসিংহায় ।
নমস্তেজস্তেজসে আবিরাবির্ভাব বজ্রনখ বজ্রদংষ্ট্র ।
কর্মাশয়ান রন্ধয় রন্ধয় তমো গ্রস গ্রস
ওঁ স্বাহা অভয়মভয়মাত্মনি ভূয়িষ্ঠা ওঁ ক্ষ্রৌম্ ॥

[শ্রীমদ্ ভাগবত ৭/১৮/৮]

অর্থাৎ সর্বতেজের উৎস ভগবান নৃসিংহদেবকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। হে ভগবান আপনার নখ এবং দন্ত বজ্রের মতো, দয়া করে আপনি আমাদের সমস্ত আসুরিক কর্মবাসনার বিনাশ করুন। দয়া করে আপনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে আমাদের সমস্ত অজ্ঞানতা দূর করুন যাতে আপনার কৃপায় আমরা জীবন সংগ্রামে নির্ভীক হতে পারি।

তস্মাদহং বিগত বিক্লব ঈশ্বরস্য
সর্বাত্মনা মহি গৃণামি যথামনীষম্।
নীচোহজয়া গুনবিসর্গ মনু প্রবিষ্টঃ
পুয়েত যেন হি পুমাননুবর্ণিতেন ॥

[শ্রীমদ্ ভাগবত ৭/৯/১২]

প্রহ্লাদ বলছেন—ভগবান একমাত্র ভক্তিতেই প্রীত হন। সেজন্য আমি নীচ বংশজাত হলেও, নিঃশঙ্কচিত্তে নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী ভগবানের মহিমা সর্বপ্রযত্নে কীর্তন করবো। কারণ অবিদ্যার বশে সংসারে এসেও কেবলমাত্র ভগবানের মহিমা কীর্তন করেই মানুষ শুদ্ধ হয়—অর্থাৎ অবিদ্যা থেকে মুক্ত হতে পারে।

এস্তোহস্ম্যহং কৃপণবৎসল দুঃসহোগ্র
সংসারচক্রকদনাৎ গ্রসতাং প্রণীতঃ।
বদ্ধ স্বকর্মভিরুশত্তম তেহঙ্ঘ্রিমূলং
প্রীতোহপবর্গশরণং হ্বয়সে কদানু ॥

[শ্রীমদ্ ভাগবত ৭/৯/১৬]

অর্থাৎ হে কৃপণ-বৎসল! হে দীনবন্ধু! সংসারচক্রের দুঃসহ ক্লেশে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছি এবং নিজের কর্মবশেই/কর্মফলেই অসুর যোনি প্রাপ্ত হয়েছি। হে অতি কমনীয়! আপনি কবে আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আপনার অপবর্গপ্রদ চরণকমলের প্রতি আমাকে আহ্বান করবেন, কবে আপনার মুক্তিপ্রদ চরণকমলে আমায় আশ্রয় দেবেন?

সোহহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ।

অজ্ঞস্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণ বিপ্রমুক্তো
দুর্গানি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ ॥

[শ্রীমদ্ ভাগবত ৭/৯/১৮]

অর্থাৎ হে নৃসিংহদেব! আপনার পদযুগলকে আশ্রয় করেছে এমন মহাজ্ঞানী ভক্তগণের সঙ্গগুণে, আমি রাগ এবং বিদ্বেষ ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে প্রিয় বন্ধু এবং পরম-দেবতাস্বরূপ আপনার মহিমময়ী লীলাকীর্তন করে আপনার ভক্তের সঙ্গলাভ করে সব ধরনের দোষ মুক্ত হয়ে মহাদুঃখসমূহ অতি তাড়াতাড়ি অতিক্রম করতে পারবো।

এখানে দুঃখনিবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। ভগবানের সেবার ইচ্ছা হলে তাঁর কৃপায় ভক্তসঙ্গ লাভ হয়। ভক্তসঙ্গের ফলে রাগ-বিদ্বেষের নিবৃত্তি হয়। এই অবস্থায় ভগবানের মহিমা ও যশ কীর্তনে মানুষের আগ্রহ হয় এবং তার ফলে সব ধরনের দুঃখ চলে যায়।

প্রহ্লাদ বলেছেন যে দুঃখ নিরসনের অনেক লৌকিক উপায় থাকলেও ভগবানের কৃপা ছাড়া কিছুই হয় না। পিতামাতার দ্বারা সুরক্ষিত হয়েও শিশুর মৃত্যু হয়। উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করার পরও রোগীর মৃত্যু হয়। নৌযান থাকা সত্ত্বেও মানুষ সমুদ্রে ডুবে মরে। কাজেই দেখা যায় আপনার কৃপাই দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়।

তত্তেহর্হওম নমঃস্তুতি কর্মপুজাঃ
কর্মস্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং
ভক্তিংজনঃ পরমহংসগতৌ লভেত ॥

[শ্রীমদ্ ভাগবত ৭/৯/৫০]

অর্থাৎ হে পূজ্যতম! প্রণাম, গুণকীর্তন, সর্বকর্ম সমর্পন, পরিচর্যা, স্মরণ-মনন এবং গুণগান শ্রবণ—এই ছয়ভাবে ভগবৎ-সেবা ছাড়া পরমহংসদের প্রাপ্তব্য ভক্তি সাধারণ মানুষ কিভাবে লাভ করবে। তাই প্রার্থনা করি আমাকে আপনি আপনার দাস্যে আপনার সেবায় নিযুক্ত করুন।

প্রহ্লাদের উপরোক্ত প্রার্থনা থেকে জানা গেল যে ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবকে দাস্যভাবে সেবা করতে হবে। তার সাথে সখ্য অথবা বাৎসল্য রসের সংযোগের কোন সুযোগ নেই। এই দাস্যভাবে সেবা করতে পারলে ভক্তের পক্ষে বৈকুণ্ঠ লাভ করা সম্ভব।

শ্রীমদ্ ভাগবতের ভাবার্থদিপীকা নামক টীকা লিখার সময় শ্রীল শ্রীধর স্বামীপাদ নৃসিংহেদেবের যে সব বন্দনা করেন তার কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা হলো।

প্রহ্লাদহৃদয়াহ্লাদং ভক্তাবিদ্যা বিদারনম্।
শরদিন্দুরুচিং বন্দে পারীন্দ্রবদনাং হরিম্ ॥

অর্থাৎ প্রহ্লাদ মহারাজের হৃদয়ে সবসময় আনন্দ দানকারী, ভক্তের অবিদ্যা বিনাশকারী, চন্দ্রের আলোর মত স্নিগ্ধ করুনা প্রদানকারী, সিংহের মতো মুখমণ্ডল যাঁর সেই শ্রীহরিকে বন্দনা করি।

নরবপু প্রতিপদ্য যদি ত্বয়ি শ্রবণবর্ণনসংস্মরণাদিভিঃ।
নর হরে ন ভজন্তি নৃণামিদং দৃতিবদুচ্ছ্ব সিতং বিফলং ততঃ ॥

অর্থাৎ হে নৃসিংহদেব! যারা মনুষ্যদেহ লাভ করেও আপনার কথা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ দ্বারা ভজনা না করে তাদের শ্বাস গ্রহণ বা জীবনধারণ হাপরের মতই বিফল।

ত্বদংশস্য মমেশান ত্বন্মায়াকৃত বন্ধনম্।
ত্বদঙ্ঘ্রি সেবামাদিশ্য পরানন্দ নিবর্তয় ॥

হে ভগবান, হে পরানন্দ, আপনার চরণকমলে সেবা প্রদান করে আপনার মায়ার বন্ধন থেকে আপনার অনুঅংশরূপে আমাকে মুক্ত করুন।

ত্বয্যাত্মনি জগন্নাথে মন্মনো রমতামিহ।
কদা মমেদৃশং জন্ম মানুষং সম্ভবিষ্যতি

অর্থাৎ কখনো আবার এই মনুষ্য জনম পাব কিনা তার ঠিক নেই। তাই হে জগন্নাথ, হে পরমাত্মা, এই জন্মেই আমার মন আপনাতে সমর্পিত হউক।

চরণস্মরণং প্রেমনা তব দেবসুদুর্লভম্ ।
যথাকথঞ্চিন্নৃহরে মম ভূয়াদহর্নিশম্ ॥

অর্থাৎ হে নৃসিংহদেব! প্রেম এবং আর্তির সাথে আপনার শ্রীচরণ সুদুর্লভ হলেও যেকোন উপায়ে দিবারাত্রি আপনার পাদপদ্ম যেন আমার স্মরণ হয়।

ক্বাহং বুদ্ধ্যাদিসংরুদ্ধঃ ক্ব চ ভূমন মহস্তব ।
দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো ভক্তিং মে নৃহরে দিশ ॥

অর্থাৎ হে ভূমন! অহংকার ইত্যাদিতে আমি আচ্ছন্ন, আর কোথায় আপনার মহিমারাশি! হে দীনবন্ধু, হে দয়ার সিন্ধু! হে নরহরি! আমাকে ভক্তি প্রদান করুন।

যৎসত্ত্বতঃ সদাভাতি জগদেৎ স্বত ।
সদাভাসমসত্যস্মিন্ ভগবন্তং ভজাম তম্ ॥

অর্থাৎ—যাঁর সত্তাতে স্বাভাবিকভাবেই এই জগৎ সৎরূপে প্রতিভাত হয়, এই অনিত্য জগতে নিত্যপ্রকাশ স্বরূপ সেই ভগবানকে ভজনা করি।

অন্তর্যন্তা সর্বলোকস্য গীতঃ
শ্রুত্যা যুক্ত্যা চৈবমেবাবসেয়ঃ।
যঃ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি নৃসিংহঃ
শ্রীমন্তং তং চেত সৈবাবলম্বে ॥

অর্থাৎ শ্রুতি কর্তৃক যিনি সবলোকের অর্ন্তযামীরূপে ব্যাখ্যাত, যুক্তি দ্বারাও এইরূপ ধারণা করা যায় না, যিনি সবকিছুই জানেন, সর্বশক্তিমান যিনি লক্ষ্মীদেবীর সাথে বিরাজিত, সেই নৃসিংহদেবকে আমি হৃদয়ে ধারণ করি।

সংসারচক্র-ক্রকচৈবিদীর্নমুদীর্ন নানাভবতাপতপ্তম্ ।
কথাঞ্চিদাপন্নামি প্রপন্নং ত্বমুদুর শ্রীনৃহরে নৃলোরাম্ ॥

অর্থাৎ হে নৃসিংহদেব! সংসারচক্ররূপিনী করাত দ্বারা বিদীর্ন, বিভিন্ন জাগতিক তাপে দগ্ধ এবং বিপন্ন হয়ে কোনরকমে শরনাগত হয়েছে—এই রকম ব্যক্তিদেরকে আপনি উদ্ধার করুন।

ভজতোহি ভবান্ সাক্ষাৎ পরমানন্দচিদ্‌ঘন।
আত্মৈব কিমতঃ কৃত্যং তুচ্ছদারসুতাদিভি ॥

অর্থাৎ ভজনকারী ভক্তের কাছে আপনি সাক্ষাৎ পরমানন্দময় চিন্ময় বিগ্রহ পরমাত্মা। তাই তুচ্ছ স্ত্রী-পুত্রাদির আর প্রয়োজন কি?

প্রহ্লাদ মহারাজ যে যে ভাবে ভগবান নৃসিংহদেবের প্রার্থনা করেছিলেন আমাদেরও উচিত সেইভাবে একান্তভাবে প্রার্থনা করা। এই বিষয়টি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ-বইতে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। (শ্লোক ৩৬-৪০)। নীচে তাঁর কর্তৃক রচিত ৫টি শ্লোক এবং তার ব্যাখ্যা দেয়া হল।

শ্লোক-৩৬

এ দুষ্ট হৃদয়ে কাম আদি রিপু ছয়।
কুটিনাটী প্রতিষ্ঠাশা সত্য সদা রয় ॥
হৃদয়-শোধন আর কৃষ্ণের বাসনা।
নৃসিংহ চরনে মোর এইতো কামনা ॥

অর্থাৎ আমার এই পাপপূর্ণ হৃদয়ে কামসহ অপরাপর ছয়টি রিপু বিরাজ করছে যা শত্রু হিসাবে কাজ করছে। এর সাথে কপটতা, যশ লাভের আশা-আকাঙ্খা, প্রতিষ্ঠা লাভসহ কুটীল মনোভাবও রয়েছে। শ্রী নৃসিংহদেবের চরণে আমার প্রার্থনা এই যে তিনি যেন কৃপা করে আমার হৃদয়কে শোধন করে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার বাসনা প্রদান করেন।

শ্লোক-৩৭

কান্দিয়া নৃসিংহপদে মাগিব কখন।
নিরাপদে নবদ্বীপে যুগল-ভজন ॥
ভয় ভয় পাঞা যারা দর্শনে সে হরি।
প্রসন্ন হইবে কবে মোরে দয়া করি ॥

অর্থাৎ কেঁদে কেঁদে আমি শ্রী নৃসিংহদেবের চরণ কমলে, সব রকমের বাধা-বিঘ্ন থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ নিরাপদে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভজনার জন্য আশীর্বাদ কামনা করবো। যাঁর ভয়ংকর রূপ স্বয়ং ভয়েরও (যমরাজ) ভয় উৎপন্ন করে সেই ভগবান শ্রীহরি কবে আমার উপর প্রসন্ন হবেন এবং আমাকে কৃপা প্রদর্শন করবেন।

শ্লোক-৩৮

যদ্যপি ভীষণ মূর্ত্তি দুষ্টজীব প্রতি।
প্রহ্লাদাদি কৃষ্ণভজনে ভদ্র অতি ॥
কবে বা প্রসন্না হঞা স্বকৃপাবচনে
নির্ভয় করিবে এই মূঢ় অকিঞ্চনে ॥

অর্থাৎ শ্রী নৃসিংদেব দৃষ্ট লোকদের প্রতি ভয়ঙ্কর হলেও প্রহ্লাদ এবং এই জাতীয় ভক্তদের প্রতি পরম শুভময়। কারণ তাঁরা কৃষ্ণ ভজনে রত। তাই কবে আমার মতো এই মূঢ় এবং অকিঞ্চনকে নিজের কৃপা-প্রদান করে ভয়মুক্ত করবেন।

শ্লোক-৩৯

স্বচ্ছন্দে বৈস হে বৎস শ্রীগৌরাঙ্গধামে।
যুগল-ভজন হউ রতি হউ নামে ॥
মম ভক্ত কৃপা-বলে বিঘ্ন যাবে দূর।
শুদ্ধ চিতে ভজ রাধাকৃষ্ণ-রস-পুর ॥

অর্থাৎ তিঁনি (নৃসিংহদেব) বলবেন, হে বৎস, নির্ভয়ে বসে থাক এবং এই শ্রীগৌরাঙ্গধামে সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস কর। শ্রী রাধাকৃষ্ণের আরাধনার মাধ্যমে, তাঁদের পবিত্র নামের প্রতি তোমার আসক্তি বিকশিত হউক। আমার ভক্তগণের কৃপায় সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূর হয়ে যায়। শুদ্ধ হৃদয়ে কেবলমাত্র শ্রী রাধাকৃষ্ণ ভজনা কর। কারণ এরূপ ভজনা প্রেম-রসে ভরপুর।

শ্লোক-৪০

এই বলি কবে মোর মস্তক উপর।
স্বীয় শ্রীচরণ হর্ষে ধরিবে ঈশ্বর ॥

অমনি যুগল-প্রেমে সাত্ত্বিক বিকারে।
ধরায় লুটিব আমি শ্রী নৃসিংহদ্বারে ॥

অর্থাৎ এই কথা বলে কবে এবং কখন ভগবান তাঁর নিজের দিব্য পাদপদ্ম আনন্দের সাথে আমার মাথায় স্থাপন করবেন? আমি শ্রী রাধাকৃষ্ণের জন্য সশ্রদ্ধ প্রেম লাভ করবো? আর তার ফলে শুদ্ধ-সাত্ত্বিক বিকার প্রাপ্ত হয়ে শ্রী নৃসিংহ মন্দিরের দ্বারদেশের ভূমিতে পবিত্র হয়ে গড়াগড়ি দেব।

জীব যতক্ষণ অজ্ঞানের গভীর অন্ধকার থেকে সৃষ্ট জড়-জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত না হয় ততদিন পর্যন্ত সে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হতে পারে না। জড়বাসনার মূর্ত প্রতীক হিরণ্যকশিপুকে সংহারকারী ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবের কৃপা চাওয়া আমাদের সবসময় উচিত। হিরণ্য শব্দের অর্থ স্বর্ণ বা সম্পদ এবং কশিপু শব্দের অর্থ কোমল আসন বা শর্য্যা। এর অর্থ হল বিষয়ে আসক্ত মানুষ সর্বদা নিজের দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে। এজন্য তাদের প্রচুর স্বর্ণ—অর্থাৎ ধন-সম্পত্তির প্রয়োজন হয়। এই অর্থে হিরণ্যকশিপু জড় জাগতিক তথাকথিত জীবনের আদর্শ প্রতীক। এজন্যই সে পরম ভগবদ্ ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের প্রচুর বিড়ম্বনার কারণ হয়েছিল। এক সময় ভগবান নৃসিংহদেব এসে তাকে নিহত করেন। তাই যে বা যারা এই জড়জগতের অহেতুক কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হতে চান তার বা তাদের উচিত প্রহ্লাদ মহারাজ যেভাবে শ্রী নৃসিংহদেবের প্রার্থনা করেছিলেন ঠিক সেইভাবে প্রার্থনা করা।

শ্রী নারদ মুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে হিরণ্যকশিপুর কাহিনী বর্ণনা করে বলেছিলেন—

এতদ্ য আদিপুরুষস্য মৃগেন্দ্রলীলাং
দৈত্যেন্দ্রযূথপবধং প্রযতঃ পঠেত।
দৈত্যাত্মজস্য চ সতাং প্রবরস্য পুণ্যং
শ্রুত্বাণুভাবমকুতোভয়মেতি লোকম্ ॥

[শ্রীমদ ভাগবত ৭/১০/৪৭]

অর্থাৎ যিনি আদি পুরুষ বিষ্ণু এই নৃসিংহ-লীলারূপ হিরণ্যকশিপুবধ কাহিনী শুদ্ধ-হৃদয়ে পাঠ করবেন, তিনি সাধু শ্রেষ্ঠ দৈত্যেন্দ্র পুত্র প্রহ্লাদের পুণ্য কথা শ্রবণ করে অভয়পদ বৈকুণ্ঠ ধাম লাভ করবেন।

১.৭ শ্রী নৃসিংহ চতুর্দশী এবং তার মাহাত্ম

জৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে ভগবান শ্রী নৃসিংহদেব আবির্ভূত হন যা নৃসিংহ চতুর্দশী নামে পরিচিত। ভক্তগণ এই দিনে সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস থেকে ভক্তি পথের সবধরনের বিঘ্ননাশকারী ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবের আবির্ভাব লীলা ও মাহাত্ম শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে পাঠ ও শ্রবণ করে এই ব্রত পালন করেন।

বৃহন্নারসিংহ পুরানে নৃসিংহ-প্রহ্লাদ সংবাদে বলা হয়েছে—

বর্ষে বর্ষে তু কর্তব্যং মম সন্তুষ্টি কারণম্।
মহা গুহ্যমিদং শ্রেষ্ঠং মানবৈভর্বভীরু ভিঃ ॥

অর্থাৎ নৃসিংহদেব বললেন, বছর বছর আমার সন্তুষ্টির জন্য চতুর্দশীব্রত করা কর্তব্য। জন্ম ও মৃত্যুময় এই সংসার ভয়ে ভীত মানুষ এই পরম গোপনীয় এবং শ্রেষ্ঠ ব্রত পালন করবে।

শ্রী নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজকে বললেন—

য ইদং মদ্ ব্রতাগ্যন্তু প্রবিধাস্যন্তি মানবাঃ।
ন তেষাং পুনবাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥

অর্থাৎ যে সব মানুষ আমার ব্রত পালন করবে, শত কোটি কল্পেও (১ কল্প = জড়জগতের ৪৩২ কোটী বছর) তাদের আর কখনো দুঃখ এবং ক্লেশপূর্ণ সংসারে পুনরাগমণ (পুনরায় জন্ম লাভ) করতে হবে না।

শ্রী নৃসিংহদেব আরও বলেন, আমার ব্রতদিন জেনেও যে মানুষ তা পালন করে না, চন্দ্র ও সূর্য যতদিন থাকবে ততদিন পর্যন্ত সে নরক-যাতনা ভোগ করবে। ভগবান নৃসিংহেদেব নিজেই বলেছেন তার এই ব্রত পালন করলে কি সুফল লাভ হয়।

১. পূর্বজন্মে নিজের অজ্ঞাতে এই ব্রত পালন করায় বসুদেব নামধারী বেশ্যাশক্ত ব্রাহ্মণ যুবকই পরবর্তী জন্মে প্রহ্লাদ নামধারী ভক্ত রূপে আবির্ভূত হয়।

২. সৃষ্টি শক্তি লাভের জন্য স্বয়ং ব্রহ্মা নৃসিংহ চতুর্দশীব্রত পালন করেছিলেন।

৩. শিব ত্রিপুর নামক অসুরকে নিহত করার জন্য শক্তি সঞ্চয়ের লক্ষ্যে এই ব্রত পালন করেছিলেন।

৪. দেবতারা স্বর্গে অবস্থান ও স্বর্গ সুখের লাভের উদ্দেশ্যে নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত পালন করেছিলেন।

৫. এই ব্রতের প্রভাবে অপুত্রক পুত্র লাভ করে, দরিদ্র ধনী হয়, দুর্বল ব্যক্তি শক্তি লাভ করে, অল্পায়ু ব্যক্তি দীর্ঘায়ু লাভ করে।

৬. স্ত্রীলোকেরা এই ব্রত ভক্তিভাবে পালন করলে ভাগ্যবতী হয়। কারণ এই ব্রতের প্রভাবে সৎপুত্র লাভ হয়, বিধবা হওয়ার সম্ভাবনা চলে যায়, পুত্রশোক বিনাশ করে এবং দিব্য সুখ প্রদান করে।

৭. স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে যারাই এই মহতী ব্রত পালন করে শ্রী নৃসিংহদেব তাদেরকে সুখ এবং ভূক্তি-মুক্তি ফল প্রদান করেন।

শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ থেকেও দেখা যায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রী গৌরহরি একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী, শ্রী রামনবনী ব্রত পালনের পাশাপাশি নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত করার জন্য তার ভক্তদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। তবে শ্রী শ্রী হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এই চতুর্দশী ব্রত পালনের ক্ষেত্রে কিছু বিধির উল্লেখ করেছেন—

(i) ত্রয়োদশী-সংযুক্তা চতুর্দশীতে উপবাস করা যাবে না। এই অবস্থায় পরদিন উপবাস থেকে ব্রত পালন করতে হবে।

(ii) যদি কখনো বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের চতুর্দশীতে স্বাতী নক্ষত্রের যোগ হয় এবং ঐদিন শনিবার হয় অথবা যদি সিদ্ধি যোগ হয় তবে তা অত্যন্ত ফলদায়ক হয়।

(iii) কিন্তু ত্রয়োদশী বিদ্ধা বা সংযুক্ত চতুর্দশী যদি স্বাতী নক্ষত্র যুক্তাও হয় তাহলেও ঐদিন শ্রী নৃসিংহদেবের উপবাস হবে না।

বর্তমানে কলিযুগের প্রভাবে ভক্তবৎসল এবং ভক্তরক্ষক শ্রীনৃসিংহদেবের লীলা ও রূপের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও আসক্তি কোথায়? শ্রদ্ধা ও আসক্তি নেই। কারণ আমরা নানা প্রকার পাপকাজে

লিপ্ত। আমাদের মধ্যে কতজন ভগবান নৃসিংহদেবের মহিমা জানতে আগ্রহী? একই কথা নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজকে বলেছেন—

যথা যথা প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ
পাতকস্য কলৌযুগে।
তথা তথা বিধাস্যন্তি
মদব্রতং বিরলং জনাঃ ॥

অর্থাৎ কলিযুগে যে যে স্থানে পাপের প্রবৃত্তি হয় সেই সেই স্থানে খুব অল্প সংখ্যক লোক আমার ব্রত পালন করে।

১.৮ শ্রী নৃসিংহ কবচ

ব্রহ্মসংহিতায় তিনলোক বিজয়ী নৃসিংহ কবচের কথা ব্রহ্মা-নারদ সংবাদে লিপিবদ্ধ রয়েছে যা নীচে উল্লেখ করা হল।

শ্রীনারদ উবাচ—
ইন্দ্রাদিদেববৃন্দেশ! তাতেশ্বর! জগৎপতে!
মহাবিষ্ণোর্নৃসিংহস্য কবচং ব্রুহি মে প্রভো!
যস্য প্রপঠনাদ্ বিদ্বান্ ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥ ১ ॥
শ্রীব্রহ্মোবাচ—
শৃণু নারদ! বক্ষামি পুত্রশ্রেষ্ঠ! তপোধন!
কবচং নরসিংহস্য ত্রৈলোক্য-বিজয়াভিধম্ ॥ ২ ॥
যস্য প্রপঠনাদ্‌বাগ্মী ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ!
স্রষ্টাহং জগতাং বৎস! পঠনাদ্ধারণাদ্ যতঃ ॥ ৩ ॥
লক্ষ্মীর্জগত্রয়ং পাতি সংহর্তা চ মহেশ্বরঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্দেবা বভূবুশ্চ দিগীশ্বরাঃ ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদি-বিনিবারকম্।
যস্য প্রসাদাদ্দুর্বাসাস্ত্রৈলোক্য-বিজয়ী মুনিঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্ যস্য শাস্তা চ ক্রোধভৈরবঃ ॥ ৫ ॥

ত্রৈলোক্য-বিজয়পি কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষি—শ্চন্দ গায়ত্রী নৃসিংহো দেবতা বিভুঃ ॥ ৬ ॥
ক্ষ্রৌং বীজং মে শিরঃ পাতুঃ চন্দ্রবর্ণো মহামনুঃ।
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ৭ ॥
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যু-মৃত্যুং নমাম্যহম্।
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ ॥ ৮ ॥
কণ্ঠং পাতু ধ্রুবং ক্ষ্রৌং হৃদ্‌ভগবতে চক্ষুষী মম।
নরসিংহায় চ জ্বালামালিনে পাতু মস্তকম্ ॥ ৯ ॥
দীপ্তদংষ্ট্রায় চ তথাগ্নিনেত্রায় চ নাসিকাম্।
সর্বরক্ষোঘ্নায় সর্বভূত-বিনাশায় চ ॥ ১০ ॥
সর্বজ্বর-বিনাশায় দহ দহ ফট্ ফট।
রক্ষ রক্ষ সর্বমন্ত্রং স্বাহা পাতু মুখং মম ॥ ১১ ॥
তারাদি-রামচন্দ্রায় নমঃ পায়াদ্‌গুদং মম।
ক্লীং পায়াৎ পাশ্বযুগ্মঞ্চ তারং নমঃ পদং ততঃ।
নারায়ণায় পার্শ্বঞ্চ আং হ্রীং ক্রৌং ক্ষ্রৌং চ হুং ফট্ ॥ ১২ ॥
ষড়ক্ষরঃ কটিং পাতু ওঁ নমো ভগবতে পদম্।
বাসুদেবায় চ পৃষ্ঠং ক্লীং কৃষ্ণায় উরুদ্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥
ক্লীং কৃষ্ণায় সদা পাতু জানুনী চ মনূত্তমঃ।
ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদ্বয়ম্ ॥ ১৪ ॥
ক্ষ্রৌং নরসিংহায় ক্ষ্রৌঞ্চ সর্বাঙ্গং মে সদাবতু ॥ ১৫ ॥
ইতি তে কথিতং বৎস সর্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥ ১৬ ॥
গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহ্নীয়াৎ কবচং ততঃ।
সর্বপুণ্যযুতো ভূত্বা সর্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥ ১৭ ॥
শতমষ্টোত্তরঞ্চৈব পুরশ্চর্যাবিধিঃ স্মৃতঃ।
হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা সাধক-সত্তমঃ ॥ ১৮ ॥
ততস্তু সিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্মা মদনোপমঃ।
স্পর্ধামুদ্ধূয় ভবনে লক্ষ্মীবাণী বসে ত্তঃ ॥ ১৯ ॥

পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
অপি বর্ষ-সহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০ ॥
ভূর্জে বিলিখ্য গুলি স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ম্ ॥ ২১ ॥
যোষিদ্ বামভূজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে করে।
বিভূয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥ ২২ ॥
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।
জন্মবন্ধ্যা নষ্টপুত্রা বহুপুত্রবতী ভবেৎ ॥ ২৩ ॥
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
ভূত-প্রেত-পিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে।
তং দৃষ্টা প্রপলায়ন্তে দেশাদ্দেশান্তরং ধ্রুবম্ ॥ ২৫ ॥
যস্মিন্ গেহে চ কবচং গ্রামে বা যদি তিষ্ঠতি।
তং দেশন্তু পরিত্যজ্য প্রযান্তি চাতিদূরতঃ ॥ ২৬ ॥

১.৯ শ্রী নৃসিংহদেবের যন্ত্রম্

তন্ত্রশাস্ত্রবিদগণ ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবের কৃপা যাতে কোন ভক্ত বা সাধক পেতে পারেন সে জন্য একধরনের যন্ত্রম তৈরির উপায় উদ্ভাবন করেছেন। এই যন্ত্রমের মধ্যস্থানে বীজ এবং সাধ্যনামাদি লিখে অষ্টদল পদ্মে উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জলন্তং সর্ব্বতোমুখং নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহং-এই বত্রিশ অক্ষর মন্ত্রের চারটি করে বর্ণ নিয়ে প্রতিটি পদ্মদলে লিখতে হবে। এর চারদিক মাতৃকাবর্ণ দ্বারা আবরিত করতে হবে। তার বাইরের অংশে দুইটি ভুপুর (চতুর্ভূজ) তৈরি করে এদের প্রতিটি কোনে ক্ষ্রৌং এই মন্ত্র লিখতে হবে। এই মন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখতে হবে। এই যন্ত্র তৈরি করে যথাবিধিসহকারে কবচ বাহুতে ধারণ করলে বিষ, শত্রু ধ্বংস এবং লক্ষ্মী লাভ হয়। নৃসিংহদেবের এরূপ যন্ত্রের একটি নমুনা তৈরী করে নীচে দেখানো হল।

শ্রী নৃসিংহদেবের ধারণযন্ত্রম্
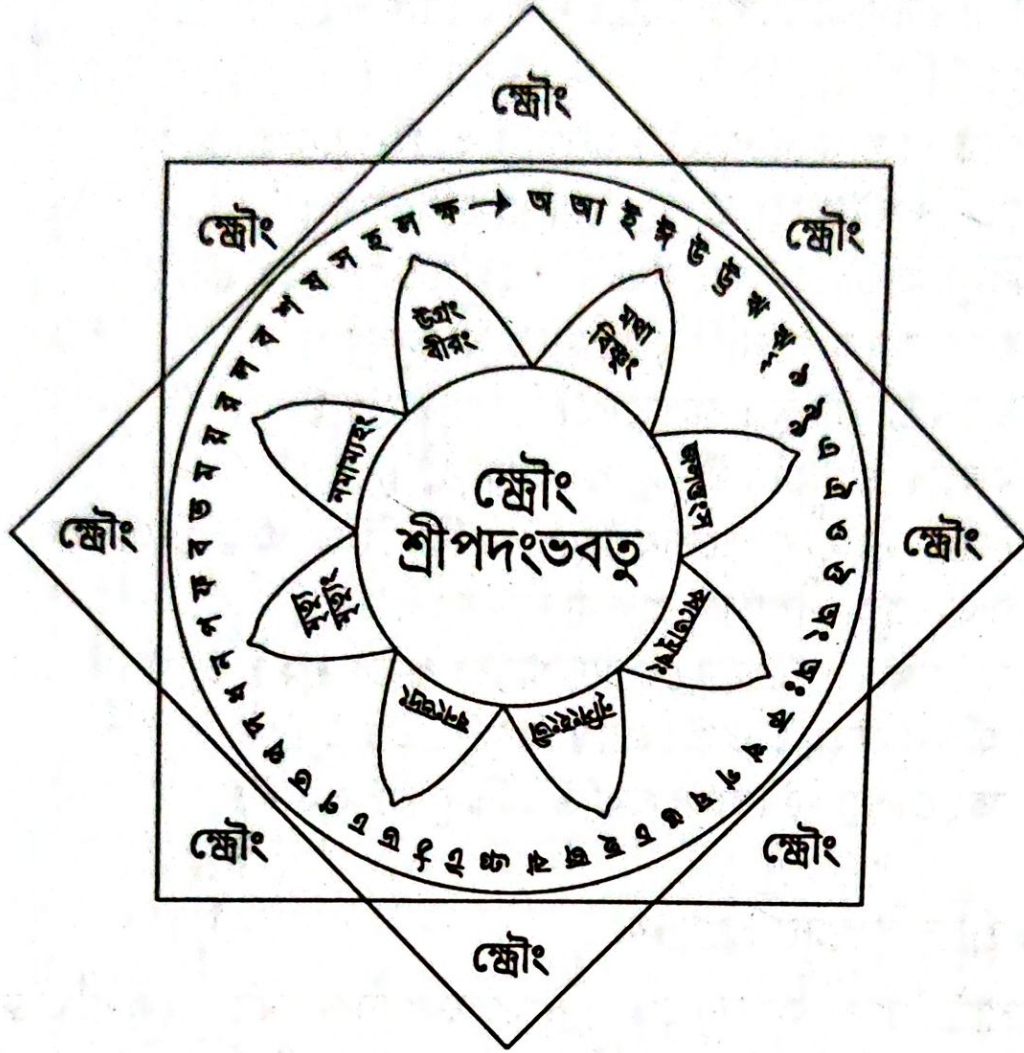
উপরে দেখানো নৃসিংহযন্ত্রম শ্রী কৃষ্ণামন্দ আগমবাগীশ তাঁর বৃহৎ তন্ত্রসারঃ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে এই যন্ত্র দ্বারা নিশ্চিৎভাবে শত্রুধ্বংস এবং লক্ষ্মী লাভ হয়।

পুস্তক-পুস্তিকা নির্দেশিকা

১. শ্রীমদ্ ভাগবতম্, ৭ম স্কন্দ।
২. শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ : বৃহৎ তন্ত্রসার, নবভারত পাবলিশার্স।
৩. শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ন গোস্বামী মহারাজ, The Fearless Prince।
৪. ভক্তবৎসল শ্রী নৃসিংহদেব : ইসকন, মায়াপুর কর্তৃক প্রকাশিত।
৫. ভগবৎ দর্শন, তৃতীয় সংখ্যা, মে, ২০০৭, ইসকন মায়াপুর।
৬. ভগবৎ দর্শন, তৃতীয় সংখ্যা মে, ২০০৮, ঐ।

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

শ্রীল প্রভুপাদ।

শ্রী শ্রী বঙ্কুবিহারী জিউ মন্দির
২ নং বি কে দাস রোড, শ্যামবাজার, ঢাকা।